International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-V, September 2024, Page No.01-10
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i5.2024.01-10

শরৎ-সাহিত্য এবং নারীচেতনা

ড. পৌলমী চক্রবর্তী

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Sarat Chandra Chatterjee has portrayed female characters in Indian orthodox patriarchal society. He explained the pain and torment of lower-middle class women. Sarat Chandra Chattopadhy mentions many widows as "fallen women" in his literature. He is well known for mirroring the position of women and also drawing some strong sketches of women reflecting social issues as well as inequality and injustice meted out to them at that period of Bengal's history. His empathetic concern for women and his keen insight into their minds has often been commented on and appreciated. This paper is concerned with constructing his women characters representing various strata of society. The women must have purity, virtue and integrity otherwise they become victimized by the conservative patriarchal society. Most of his women characters share an extraneous relationship with society. Sarat demonstrates the complex conundrums of widows' sufferings, child-marriage, disease, poverty, public bias and fallen women's victimization which focused his perception of social realism. He also satirically represents the prevalent system of child-marriage and dowry which has infested the so-called modern society asserts to bring the estimation of women at par with that of men.

Keywords: Feminism, Virtue, Empowerment, Society, Suffering.

নারীবাদী চিন্তাভাবনার মধ্যে যে বৈচিত্র্য আমরা প্রত্যক্ষ করি তার মধ্যেও কিছু দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে তাদের সাধারণীকরণ সম্ভব এবং তার দ্বারাই নারীবাদী গবেষণার স্বরূপটি চিহ্নিত করা যেতে পারে। সমাজের উপর পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও তার আধিপত্যের ফলে লিঙ্গসাম্য ও সমানাধিকারের অভাব- এর বিরুদ্ধেই মূলত নারীবাদীদের যুদ্ধ। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য এই সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন। সমাজের বৃহত্তর পরিসরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি সমাজের যে দমনমূলক মনোভাব, যা প্রকৃতপক্ষে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কোনো না কোনো প্রকার হিংসা থেকে জাত, এইধরনের বৈষম্য থেকে মুক্তিই নারীবাদীদের লক্ষ্য এবং নারীবাদী গবেষণার সঙ্গে এই লক্ষ্য নৈতিকভাবে সম্পৃক্ত। কিন্তু অবস্থানগত দিক থেকে নারীবাদীদের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, এর অনেক দৃষ্টিভঙ্গিই একদেশদর্শীতাযুক্ত, যেখানে পুরুষতন্ত্রের কৌশলে নারীরাও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, এখানে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অবহেলিত এবং এ ধারণা একটি দমন থেকে মুক্তির

পরে সমাজে আরেকটি দমনমূলক মনোভাবের জন্ম দেয়। এই সমস্ত দিক থেকে দেখতে গেলে নারীবাদী গবেষণার পদ্ধতি ও কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হয় না।

প্রাচীন সমাজবিজ্ঞান সমাজে লিঙ্গের বিন্যাসভঙ্গিকে সমর্থন করে থাকে বলে নারীবাদীরা মনে করেন। তাই তাঁরা এই জাতীয় আলোচনার ভঙ্গির প্রতি সন্দিহান। তাঁরা সর্বক্ষণ এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেন যা নারীদের উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রসারিত করবে এবং স্বাধীনভাবে তাদের জীবন ধারণের সুযোগ প্রদান করবে। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের যে সমস্ত কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছিল তা তৎকালীন সমাজে একটি দমনমূলক মানসিকতা থেকে জন্ম নিলেও আধুনিক যুগে তাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিরীক্ষন করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। তাই কোনোরূপ ঘেরাটোপে আবদ্ধ হয়ে থাকা নয় বরং নারীবাদী গবেষণা সর্বদা মুক্তির প্রসারিত ক্ষেত্র অনুসন্ধানে রত। এই অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্রের বিশ্লেষণ এবং প্রচীন ভারতীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রসঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধে শরৎ সাহিত্যে নারীর অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র সমসাময়িক যুগে অবতীর্ণ হয়েও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ব্যপ্তির একটি নির্দিষ্ট পথের গভীরে গিয়ে অন্তর্নিহিত সত্যের অনুসন্ধান ও উন্মোচনে প্রবৃত্ত হয়েছে। শরৎ-সৃষ্টির পরিক্রমণ রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই, এবং অনস্বীকার্যভাবে বলা যায় সেখানে তাঁর স্বাতন্ত্র্য বর্তমান, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবগুরু কিন্তু শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি তার আপন বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল। অনিলা দেবী ছদ্মনামে তাঁর লেখক-পরিচিতি ছিল সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকে। শরৎ-সাহিত্যের নায়িকারাও আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। সমাজের রক্ষণশীল ধারণা ও তার যূপকাষ্ঠে ক্রমাগত বলিপ্রদত্ত নারীদের এক আশ্চর্য জীবনবেদ শরৎচন্দ্রের সাহিত্য -সৃষ্টি। সমাজের চিরাচরিত ধারণার ভিত্তিমূলে আঘাতের সিদ্ধান্ত তাঁকে দ্বিধান্বিত করেনি। ভারতীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চিরকাল যে নারীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে খর্ব করার চেষ্টা করেছে প্রতিনিয়ত, তাদের সামাজিক পরিস্থিতি ও মনের বিচিত্র গতিবিধি অনায়াস দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন শরৎচন্দ্র, অবশ্যই এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছে তাঁর সহানুভূতিশীল মন। তাঁর দরদী মনের গভীরতা ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে দিয়েছে অবিস্মরণীয় কথাশিল্পীর মর্যাদা। সমাজের মধ্য নারীদের অবস্থানজনিত যে নিয়তি, তার বিরুদ্ধে শরৎ-সাহিত্য মুখর। নারীচরিত্র সৃষ্টির গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ না ক'রে শরৎচন্দ্র এখানে হয়ে উঠেছেন ব্যতিক্রমী। তাই তাঁর চরিত্রগুলি কোনো কল্পলোকচারিণী বা 'মায়াবনবিহারিণী' নয় বরং দৃষ্টিলোকের সহজলভ্য রক্তমাংসের মানবী। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে নারীর বেদনা ও সমাজের সঙ্গে নারীমনের দ্বন্দ্ব চিত্রিত করতে তিনি সিদ্ধহস্ত।

ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- 'ছন্নছাড়া জীবনযাপন ক'রে, নীতি দুর্নীতির প্রশ্নকে অবহেলাভরে উপেক্ষা ক'রে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে জীবনধারা অনুসরণ করেছেন, তার প্রতি আমাদের মতো বদ্ধ জীবের প্রবল আকর্ষণ থাকলেও সে জীবন সমাজ সংসারে সংসারী মানুষের পক্ষে খুব লোভনীয় নয়, তা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু শরৎচন্দ্র সমাজ, সংসার প্রভৃতি সংস্কার ও বন্ধনের দ্বারা কোনদিনই নিয়ন্ত্রিত হননি। তার এই বন্ধন-অসহিষ্ণু 'বোহেমিয়ান' জীবনযাত্রা

সে যুগে নীতিবাগীশদের ততটা মনঃপূত হয়নি।'[1] তিনি বাংলার সাধারণ নর-নারীর মলিন ও তুচ্ছ জীবনকেই তাঁর সাহিত্যের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং নারীদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয়েছে সেই অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের পথ ধরেই। নারীজীবনকে খুব কাছ থেকে অনুভব করেছিলেন শরৎচন্দ্র। প্রবন্ধের মাধ্যমে লেখকের বিশুদ্ধ ভাবনার সঙ্গে সরাসরি পরিচয় স্থাপন করা সম্ভব হয়। অনিলা দেবী ছদ্মনামে তাঁর রচিত 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটির মাধ্যমেই আমরা তাঁর নারীভাবনার স্বরূপটি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত হতে পারি। 'যমুনা' পত্রিকায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়-

'মণি-মাণিক্য মহামূল্য বস্তু, কেন না, তাহা দুষ্প্রাপ্য। এই হিসাবে নারীর মূল্য বেশী নয়, কারণ, সংসারে ইনি দুষ্প্রাপ্য নহেন। জল জিনিসটা নিত্য-প্রয়োজনীয়, অথচ ইহার দাম নাই। কিন্তু যদি কখন ঐটির একান্ত অভাব হয়, তখন রাজাধিরাজও বোধ করি একফোঁটার জন্য মুকুটের শ্রেষ্ঠ রত্নটি খুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন না। তেমনি—ঈশ্বর না করুন, যদি কোনদিন সংসারে নারী বিরল হইয়া উঠেন, সেই দিনই ইঁহার যথার্থ মূল্য কত, সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে—আজ নহে। আজ ইনি সুলভ।

কিন্তু দাম যাচাই করিবারও একটা পথ পাওয়া গেল। অর্থাৎ পুরুষের কাছে নারী কখন, কি অবস্থায়, কোন্ সম্পর্কে কতখানি প্রয়োজনীয়, তাহা স্থির করিতে পারিলে নগদ আদায় হউক আর না হউক, অন্ততঃ কাগজে-কলমে হিসাব-নিকাশ করিয়া ভবিষ্যতে একটা নালিশ-মকদ্দমারও দুরাশা পোষণ করিতে পারা যায়। একটা উদাহরণ দিয়া বলি। সাধারণতঃ, বাটীর মধ্যে বিধবা ভগিনীর অপেক্ষা স্ত্রীর প্রয়োজন অধিক বলিয়া স্ত্রীটি বেশি দামী। আবার এই বিধবা ভগিনীর দাম কতকটা চড়িয়া যায় স্ত্রী যখন আসন্ন-প্রসবা; যখন রাঁধা-বাড়ার লোকাভাব, যখন কচি ছেলেটাকে কাক দেখাইয়া বক দেখাইয়া দুইটা খাওয়ান চাই। তাহা হইলে পাওয়া যাইতেছে— নারী ভগিনী-সম্পর্কে বিধবা অবস্থায়, নারী ভার্যা-সম্পর্কীয়ার অপেক্ষা অল্প মূল্যের।'[2]

ভারতীয় সমাজে নারীর মূল্য যে কেবল সংসারে তার প্রয়োজনীয়তাভিত্তিক তা স্পষ্ট ক'রে দেখিয়েছেন শরৎচন্দ্র। সতীত্বের প্রমাণ কেবল নারীদেরই দেওয়ার বিষয়, পুরুষদের নয়। মহাভারত রামায়ন মহাকাব্যাদিতে সতীত্ব সম্পর্কিত যে আলোচনা তা কেবল নারীদের কেন্দ্র করেই, পুরুষের চরিত্রের বিশুদ্ধতা নামক কোনো বিষয়বস্তু প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি ভারতীয় সমাজের আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠেনি। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন -

'নারীত্বের মূল্য কি? অর্থাৎ, কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখে কষ্টে মৌনা। অর্থাৎ, তাঁহাকে লইয়া কি পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে। এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী! অর্থাৎ পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবেন।দাম কষিবার এ ছাড়া যে অন্য কোনো পথ নাই, সে কথা আমি পৃথিবীর ইতিহাস খুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারি।'[3]

---

[1] বন্দোপাধ্যায়, অসিত কুমার. (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ). আধুনিক *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত,* কলকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সি. পৃঃ ১৮৭.

[2] চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). *শরৎ সমগ্র ৪.* নারীর মূল্য. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট. পৃঃ ৪৬৬.

[3] চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). *শরৎ সমগ্র ৪.* নারীর মূল্য. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট. পৃঃ ৪৬৬.

সমস্ত সামাজিক নিয়মকানুন মূলত নারীদের পুরুষের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন ও স্বাধীনতাকে যতখানি ব্যাহত করেছে, তা আর অন্যকিছুর দ্বারা ঘটেনি। বারংবার বিবাহিত নারীরা স্বামীর কাছে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হয়েছে নিজের যোগ্যতার, এবং এই যোগ্যতা সর্বদাই ছিলো পুরুষসাপেক্ষ। কেবল ত্রুটিহীন স্বামীপরায়ণতাই সেখানে মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো, যা কখনোই যোগ্যতা পদবাচ্য হতে পারে না। উপরোক্ত প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের বক্তব্যটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য-

'প্রথম, সতীত্বের বাড়া নারীর আর গুণ নাই। সব দেশের পুরুষই এ কথা বোঝে, কেন না, এটা পুরুষের কাছে সবচেয়ে উপাদেয় সামগ্রী। এবং স্বামীর অবাধ্য হওয়া,— তিনি অতি বড় পাষণ্ড হইলেও— তাঁহাকে মনে মনে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মত দোষ আর নাই। একটা অপরটার corollary; এই সতীত্ব যে নারীর কতবড় ধর্ম হওয়া উচিত, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে সে কথার পুনঃ পুনঃ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এ দেশে এ তর্ক এত অধিক হইয়াছে যে, এ সম্বন্ধে আর বলিবার কিছু নাই। এখানে স্বয়ং ভগবান পর্যন্ত সতীত্বের দাপটে কতবার অস্থির হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত তর্কই একতরফা— একা নারীরই জন্য। পুরুষের এ সম্বন্ধে যে বিশেষ কোন বাধ্যবাধকতা ছিল, তাহা কোথাও খুঁজিয়া মেলে না, এবং এতবড় একটা প্রাচীন দেশে পুরুষের সম্বন্ধে একটা শব্দ পর্যন্ত যে নাই এ কথা খুলিয়া বলিলে হাতাহাতি বাধিবে, না হইলে বলিতাম। ইংরাজ বলে, 'chastity', তবুও ইহার দ্বারা তাহারা নরনারী উভয়কেই নির্দেশ করে, কিন্তু এ দেশে ও কথাটার বাংলা করিলে 'সতীত্ব' দাঁড়ায়; সেটা নিছক নারীরই জন্য।'[4]

এই সতীত্বের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করেছেন শরৎচন্দ্র মানবিক গুণাবলীর অকৃত্রিম প্রকাশের সাপেক্ষে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে পিয়ারির (রাজলক্ষ্মী) শ্রীকান্তের প্রতি যে আবাল্যসঞ্চিত প্রণয় তা চিরন্তন মানবীয় আবেগের অকুণ্ঠিত প্রকাশ। বিপথে চালিত হয়েও সে নিজের হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেমধর্মকে বিসর্জন দিতে পারেনি। সেই প্রণয়বশতই শ্রীকান্তকেও বিপদ থেকে উদ্ধার করার আবেদন জানিয়েছে সে। তাকে অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছে। পরিশেষে ভবঘুরে জীবন পরিত্যাগ করে সে পুনরায় স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে চেয়েছে পিয়ারিরই প্রণয়ে আবদ্ধ হয়ে। বিপথগামী নারীর এই পথ পরিক্রমার নেপথ্যে যে জীবনের রক্তিম ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা চিরকাল সমাজের অগোচরেই থেকে যায়, সমাজের আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে, তার বর্তমান পরিস্থিতিটি। নারীর স্বীয় অন্তরে সুপ্ত গুণগুলি অপরিচিতই থেকে যায় সমাজের দৃষ্টিতে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে সংসার বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথ থেকে সরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় শ্রীকান্ত উচ্চারণ করতে বাধ্য হয়েছে-

> 'আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া নিজের দুর্বলতার কাছেই পরাজিত হইলাম, এই কথাটা মনে করিয়া অবশেষে যখন আত্মসমর্পণ করিলাম।...রাজলক্ষ্মী যাদুমন্ত্র জানে।'[5]

আবার শ্রীকান্ত উপন্যাসেরই অন্নদা দিদি নামক চরিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে তার শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের প্রতি অকৃত্রিম বাৎসল্যের উৎসারণে। একটি পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকায় এই বিপুল উপন্যাসে অন্নদা দিদির ক্ষণিক উপস্থিতি তার আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মোহিতলাল মজুমদারের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য -

---

[4] চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). *শরৎ সমগ্র ৪.* নারীর মূল্য. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট. পৃঃ ৪৬৭.

[5] চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). *শরৎ সমগ্র ৫.* শ্রীকান্ত. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট. পৃঃ ১৮৬.

'আমাদের দেশে, আমাদের দেশে কেন, সব দেশেই নারীর প্রকৃতিতে বা চরিত্রে এমন একটা কিছু আছে যা পুরুষ প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত, এজন্যই পুরুষ কখনো নারীকে বুঝতে পারিল না। পারিবার প্রয়োজনও তাহার হয় নাই, তাহাতে সাধারণ জীবনযাত্রায় বাধে না।'[6]

অন্নদা দিদির মধ্যে রয়েছে একজন আত্মোৎসর্গীকৃত নারী জীবনের কৃচ্ছ্রসাধনার অপরিসীম ক্ষমতা, তা নারী শক্তির একটি অনন্য রূপকেই প্রতিফলিত করে। শাহজীর মৃত্যুর পর অনির্দেশ্য পথে যাত্রার যে সিদ্ধান্ত অন্নদা দিদি নিয়েছে তার মধ্যে দিয়ে তার সাহসিকতাই প্রতিফলিত।

রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় মালতী চরিত্রের মাধ্যমে যে অনুরোধ শরৎচন্দ্রকে জানিয়েছেন, তার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে নারীহৃদয়ের সিংহদুয়ারে তাঁর অবারিত যাতায়াতের নৈপুণ্যের ইঙ্গিত-

'তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড়ো দুঃখ তার।
তারও স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও
কেমন করে প্রমাণ করবে সে,
এমন কজন মেলে যারা তা ধরতে পারে।
কাঁচা বয়সের জাদু লাগে ওদের চোখে,
মন যায় না সত্যের খোঁজে,
আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে।'

প্রেম ও স্নেহের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তাঁর নারীচরিত্রদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। চিরায়ত সমাজ সংস্কারের সঙ্গে হৃদয়-ভাবের অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁর নারীরা কখনো কখনো হয়েছে বিভ্রান্ত।

'বড়দিদি' উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। হিন্দু বিধবা রমণী মাধবীর সুরেন্দ্রনাথের প্রতি মধুর স্নেহসঞ্চারের কথা এই উপন্যাসের উপজীব্য, অর্থাৎ এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো নারীর উপর সমাজের যে প্রভাব তা নেহাতই বাহ্যিক। নারীর হৃদয়ে কোনো অনুভবের জাগরণকে সমাজ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সমাজশক্তি নারীজীবনকে কঠোর নিয়মের বেড়াজালে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিপর্য্যস্ত করতে সক্ষম। হৃদয়াবেগের অকৃত্রিমতাই সমাজের আগ্রাসনকে অবজ্ঞা করেছে বারংবার। বড় দিদির যে স্নেহ ও প্রীতি সুরেন্দ্রনাথের উপর বর্ষিত হয়েছিল তার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। বাল্যকালে তার স্বামীর মৃত্যুর পর তার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ সে বিলিয়ে বেড়ায় সবার মধ্যে। সুরেন্দ্রনাথ এর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি-

[6] মজুমদার, মোহিতলাল. (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ). *শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র.* হাওড়াঃ বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়. পৃঃ ৬৩.

'এরূপ পরিবারের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ একটা নুতন ধরনের জীবন অতিবাহিত করিবার উপায় দেখিতে পাইল। সকলে যখন একজনেরই উপর সমস্ত ভার রাখিয়াছে, তখন সেও তাহাদের মতই করিতে লাগিল। কিন্তু অপরের অপেক্ষা তাহার ধারণা একটু ভিন্ন প্রকারের। সে ভাবিত বড় দিদি বলিয়া একটি জীবন্ত পদার্থ বাটীর মধ্যে থাকে, সকলকে দেখে, সব আবদার সহ্য করে, যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা তাহারই নিকট পাওয়া যায়। কলিকাতায় আসিয়া অবধি সে একেবারে ভুলিয়া গেল যে, আপনার জন্য তাহাকে বিগত জীবনেও কোনো একটি দিনও ভাবিতে হইয়াছিল, বা পরে ভাবিতে হইবে।

জামা, কাপড়, জুতা, ছাতি, ছড়ি- যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্তই তাহার কক্ষে প্রচুর আছে। রুমালটি পর্যন্ত তাহার জন্য সযত্নে কে যেন সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে, প্রথমে কৌতুহল হইত সে জিজ্ঞাসা করিতো, উত্তর পাইতো- বড় দিদি পাঠাইয়া দিয়াছেন। জলখাবারের থালাটি পর্যন্ত দেখিলে সে আজকাল বুঝিতে পারে সযত্ন স্পর্শ ঘটিয়াছে।'[7] পরিশেষে বড় দিদির সঙ্গে মনোমালিন্য করে সে তাকে ছেড়ে চলে যায় অন্যত্র। পরে দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলে সেই মৃত্যু শয্যায় তার সঙ্গে দেখা হয় বড় দিদি মাধবীর।

'সন্ধ্যার পরে সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান হইলো চক্ষু মেলিয়া তিনি মাধবীর মুখপানে চাহিয়া রইলেন মাধবীর মুখে এখন অবগুণ্ঠন নাই। শুধু কপালের কেও ধ্বংস অঞ্চলে ঢাকা। সুরেন্দ্রের মাথা লইয়া মাধবী বসিয়াছিল।

কিছুক্ষণ চাহিয়া সুরেন্দ্র কহিল, তুমি বড় দিদি?

অঞ্চল দিয়ে মাধবী সযত্নে তাহার অষ্ট সংলগ্ন রক্ত বিন্দু মুছাইয়া দিল তাহার পর আপনার চোখ মুছিল।

তুমি বড় দিদি?

আমি মাধবী।

সুরেন্দ্রনাথ চক্ষু মুছিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, আঃ- তাই!

বিশ্বের আরাম যেন এই ক্রোড়ে লুকাইয়াছিল। এতদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ তাহা খুঁজে পাইয়াছেন। অধরের কোণে সরক্ত হাসি তাই ফুটিয়া উঠিয়াছে- বড়দিদি, যে কষ্ট!'[8]

এখানে নারীর হৃদয়ের স্বাভাবিক হৃদয়াবেগই ঔজ্জ্বল্য পেয়েছে এই উপন্যাসে। নারীর স্নেহ পরায়নতা, প্রেম, ও আন্তরিক দরদ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন শরৎচন্দ্র।

পল্লীসমাজ শরৎচন্দ্রের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত রমেশের গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের সমস্ত চেষ্টাকে প্রতিবন্ধকে জর্জরিত করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে সমাজে বেনীর মতো কিছু চরিত্র। রমা সমাজচক্রের আবর্তে পড়ে নিজের হৃদয় অনুভব প্রকাশে স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয়েছে পুরুষতন্ত্রের কঠোর প্রতিবন্ধকতার অভিঘাতে এবং বেণীর সক্রিয়তায় রমার মনে প্রথমদিকে রমেশের বিরুদ্ধে জেগেছে বিতৃষ্ণা ও প্রতিহিংসার স্পৃহা। বেণী ও গোবিন্দ হালদারের প্রতিটি অন্যায়ের সমর্থন করতে বাধ্য হয় সে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষাপটে। অন্যদিকে রমেশের হৃদয়ে গ্রামবাসীদের প্রতি যে কল্যাণকামীতা নিহিত ছিলো রমা তাকে প্রকাশ্য সমর্থন জানাতে পারে না সমাজের কারণেই। মূলত আলোচ্য উপন্যাসে কট্টোর হিন্দুসমাজ তার পুরুষতান্ত্রিকতার মাধ্যমে রমা ও রমেশের মিলনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে।

[7] চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). *শরৎ সমগ্র ১.* বড়দিদি. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট. পৃঃ ১৭৮-১৭৯.

[8] চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). *শরৎ সমগ্র ১.* বড়দিদি. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট. পৃঃ ২০২.

স্বার্থান্বেষিতা, হিংসা, দ্বেষ মানবমনকে কীভাবে বিষাক্ত করে এবং কীভাবে তার প্রভাবের প্রতিফলন লাগে নিরপরাধ প্রেমে তার দৃষ্টান্ত এই উপন্যাসে চিত্রিত। প্রকৃতপক্ষে রমার হৃদয়ের অন্তরালে ছিলো রমেশ ও তার মায়ের প্রতি দুর্বলতা কিন্তু সমাজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য হয়েছে তার মানসিকতা ও কার্যকলাপ। আবার রমা চরিত্রের একটি ভিন্ন দিক থেকে আলোচনার যোগ্য, তা হলো মানসিক ঔদার্য্য। রমার মাসির বারংবার রমেশের পিতা তারিণী ঘোষালকে 'ছোটোজাত' হিসাবে উল্লেখ করায় রমার প্রতিক্রিয়াটি লক্ষ্যণীয়। রমা নিজে কুলীনের মেয়ে হয়েও বলেছে -

'কেন মাসি তুমি মানুষের জাত নিয়ে কথা কও? জাত ত আর কারুর হাতে-গড়া জিনিস নয়। যে যেখানে জন্মেছে সেই তার ভাল।'[9] আলোচ্য উপন্যাসে বিশ্বেশ্বরী চরিত্রটিও বাৎসল্যের উৎসারণে উল্লেখযোগ্য। বেণী, রমা, রমেশ সবার প্রতিই ছিলো তাঁর আন্তরিক স্নেহের প্রকাশ।

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে সমাজের আরেক প্রভাবের কথা। জমিদার জীবানন্দ অলকা বা ষোড়শীর মাকে ষোড়শীকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েও, কেবল পণের টাকা নিয়ে পলায়ন করে। দীর্ঘদিন পরে ষোড়শীর সঙ্গে যখন জীবানন্দের সাক্ষাত হয়, সে তখন মন্দিরের ভৈরবী। এহেন পরিস্থিতিতে জীবানন্দ ষোড়শীর পিতার প্রতি অন্যায়ভাবে খাজনা ধার্য করে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জীবানন্দের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসে ষোড়শী। মূমুর্ষূ জীবানন্দের সেবা করার ফলশ্রুতিতে তার দুর্নাম রটে সমাজে। তার ভৈরবী পদটিও কেড়ে নেওয়া হয়। এভাবে সমাজের দেওয়া দুর্নাম সে বহন করে বাধ্য হয়ে। প্রথমত জীবানন্দের অনায়াসে অলকাকে ত্যাগ নারীভাগ্যনিরূপক রূপে পুরুষতন্ত্রের স্বরূপটির দিকনির্দেশনা দেয়। জীবানন্দের মানসিক নীচতা সপ্রমাণিত হয় ষোড়শীর প্রতি তারা উক্তিতে -

'তোমার কথাগুলো শুনতে মন্দ নয়। কিন্তু কান্না দেখে আমার দয়া হয় না। ও আমি অনেক শুনি। মেয়েমানুষের ওপর আমার এতটুকুও লোভ নেই- ভাল না লাগলে চাকরদের দিয়ে দিই। তোমাকেও দিয়ে দিতাম, শুধু বোধ হয় এই প্রথম একটু মোহ জন্মেছে। ঠিক জানিনে- নেশা না কাটলে ঠাওর পাচ্ছিনে।'[10] দ্বিতীয়ত জীবানন্দের সঙ্গে রাত্রিযাপনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের প্রতিক্রিয়াগুলি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শক্তির প্রাবল্যকে ইঙ্গিত করে। ষোড়শীর ভৈরবী পদ স্খলন ও সমাজের কুৎসা ইত্যাদি ঘটনা প্রেমের উপর সেই উপরোক্ত সমাজের প্রভাবের কথাটিকেই স্পষ্ট করে তোলে। আবার 'দত্তা' উপন্যাসে প্রতিবন্ধক সমাজশক্তির থেকে আসেনি, এসেছে বিজয়ার নিজস্ব লজ্জা, সংকোচ ও অন্তর্মুখিনতা থেকে।

শরৎচন্দ্রের ছোটোগল্পেও নারী চরিত্র সৃজন ও তাদের অন্তর্গহনে সুপ্ত আলোর অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন তিনি। সমাজ দৃষ্টিতে যারা বিপথগামিনী তারও অন্তর যে পরিবর্তিত হতে পারে, শরৎচন্দ্র সেই ভাবের ভাবুক।

'আঁধারে আলো' গল্পে বিপথগামিনী বিজলী চরিত্রটি অন্যতম। সত্যেন্দ্রের সংস্পর্শে তার ভাবনার ও চরিত্র পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। তার হাতে খেতে অস্বীকার করার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সত্যেন্দ্র দেখিয়েছে, তার প্রতিফল রূপেই অন্তর্দহনে দগ্ধ হয়েছে বিজলী-

---

[9] চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). *শরৎ সমগ্র ১.* পল্লীসমাজ. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট. পৃঃ ৩৮০.

[10] চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). *শরৎ সমগ্র ২.* পল্লীসমাজ. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট. পৃঃ ২৯৭.

'সত্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, দেখুন, ভুল সকলেরই হয়। আমার ভুল যে কত বড়, তা সবাই টের পেয়েছে; কিন্তু আপনারও ভুল হচ্চে। আজ নয়, আগামী জন্মে নয়- কোনকালেই আপনার ছোঁয়া খাব না। অনুমতি করুন, আমি যাই–আপনার নিঃশ্বাসে আমার রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে।'[11]

বিজলীর আসঙ্গ ত্যাগ করার পর বিজলীর অশ্রুসিক্ত চোখ তার সেই মানস পরিবর্তনের দ্যোতনা বহন করে। প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমের অনুভব যে মানুষের অন্তরের অন্তর্স্থলে একটা বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, তা বিজলীর অবস্থা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় 'স্বভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে তো উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নারীদেহের উপর শত অত্যাচার চলিতে পারে, কিন্তু নারীত্বকে তো অস্বীকার করে চলে না! বিজলী নর্তকি তথাপি সে যে নারী আজীবন সহস্র অপরাধে অপরাধী তবুও যে এটা তাহার নারী দেহ। ঘন্টাখানেক পরে যখন সে এই ঘরে ফিরে আসিল তখন তাহার লাঞ্ছিত অর্ধমৃত নারী প্রকৃতি অমৃতস্পর্শে জাগিয়া বসে আছে এই অত্যন্ত সময়টুকুর মধ্যে তাহার সমস্ত দেহে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা ওই মাতালটা পর্যন্ত টের পাইল। সেই মুখ ফুটিয়ে বলিয়া ফেলিল,- কি বাইজি চোখের পাতা ভিজে যে!'[12] সত্যেন্দ্রের প্রতি বিজলীর ভালোবাসার অন্তরায় সমাজ ছিলো না, সত্যেন্দ্রের অন্তরায় ছিলো বিজলীর পেশা। পরবর্তীকালে যে পেশাকে পরিত্যাগ করে সে তার অন্তরের অকৃত্রিম প্রেমের সম্মান বজায় রাখতে চেয়েছে। চার বছর পরে এক জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশনে এসে সত্যেন্দ্র উপলব্ধি করে বিজলির পরিবর্তন। বর্তমানে সে যে ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে তাও বুঝতে পারে সে। স্ত্রী রাধারানীকেও সেই বিষয়ে সে অবগত করে। প্রকৃতপক্ষে একজন নারী সাধারণত অভাববশত যে পেশা বেছে নেয়, সেই পরিচয়ের মধ্যে তার প্রকৃত স্বরূপ নিহিত থাকে না। সত্যেন্দ্র কেবল তাকে প্রকৃত স্বরূপটির উপলব্ধি করিয়েছে।

'রামের সুমতি', 'মেজদিদি', 'বিন্দুর ছেলে' গল্পে আবার নারীর বাৎসল্যের দিকটিকে ভাস্বর করেছে। 'রামের সুমতি' গল্পে নারায়ণীর স্নেহ বিগলিত হয়েছে তাঁর দেওর রামের প্রতি। নারায়ণীর মা দিগম্বরীর শত আপত্তি সত্ত্বেও এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও নারায়ণী নিজের মায়ের বিরুদ্ধে গিয়েছে তবু রামের প্রতি বাৎসল্যকে সে পরিত্যাগ করতে পারেনি, নিজের সন্তানের তুলনায় রামকেই যেন সে গুরুত্ব দিয়েছে বেশি-

'মা, যার মুখ আছে, সেই দিব্যি দিতে পারে, কিন্তু- বলিয়া তিনি গভীর স্নেহে রামের লজ্জিত মুখ জোর করিয়া বুকের ভিতর হইতে তুলিয়া ধরিয়া তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া বলিলেন, কিন্তু যাকে বুকে করে এতটুকুকে বড় করে তুলতে হয়, সেই জানে, হুকুম কোথা দিয়ে কেমন করে আসে। তোমাকে ভাবতে হবে না মা; এখন একটু সামনে থেকে যাও, দুটো খাইয়ে দিই। ও আমার তিনদিন অনাহারে আছে। বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের জল আবার ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।'[13] রামের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের কারণে ঘরে-বাইরে নিন্দিত হয়েছে নারায়ণী, তবু রামের প্রতি তার স্নেহ ছিল অটুট। রামও নারায়ণীর অসুস্থতার প্রেক্ষিতে নীলমণি ডাক্তারকে সাবধান করে দিয়ে এসেছে। সাঁতরাদের শশা গাছ কাটার অপরাধে নারায়ণী তাকে শাস্তি দেবার পর সে খিড়কির এঁদো পুকুরে স্নান করে আসে-

---

[11] চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). *শরৎ সমগ্র ২*. আঁধারে আলো. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট. পৃঃ ৫৯২.

[12] চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). *শরৎ সমগ্র ২*. আঁধারে আলো. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট. পৃঃ ৫৯৩.

[13] চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). *শরৎ সমগ্র ২*. রামের সুমতি. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট. পৃঃ ৫০৪.

'নারায়ণী রুক্ষস্বরে বলিলেন, পাড়ার লোকে আদরটাই দেখে, শাসনটা দেখে না।...সমস্ত সকালবেলাটা যে এক-পায়ে দাঁড়িয়ে কাঁদলে, পচা পুকুরে ডুব দিয়ে এল, ভগবান জানেন, জ্বর হবে, না কি হবে, তারপরে কি বলিস উপোস করিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিতে? ঘরে বাইরে আমার এত গঞ্জনা সহ্য হয় না রে নেত্য। বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর রুদ্ধ হইয়া, দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচল দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।'[14]

তার আগে সে অভিমানে স্কুলে যেতে চায়নি। পরে নারায়ণী তাকে ভাত বেড়ে খাইয়ে দিলে সে স্কুলে যায়। দিগম্বরী ব্রাহ্মণ ভোজনের উদ্দেশ্যে রামের কার্তিক গণেশ নামক মাছদুটিকে ধরে আনার পর রাম কিছু খেতে অস্বীকার করে, তার ফলে নারায়ণীও উপবাসী থাকেন। মাতৃসুলভ নিবিড় মমত্ববোধই দীপিত হয়ে উঠেছে নারায়ণী চরিত্রের মধ্যে।

'মেজদিদি' গল্পেও সেই মাতৃস্নেহের চিরপরিচিত আবেগ ও তজ্জনিত উৎকণ্ঠার স্বরটি শোনা যায়। বাড়ির বড়োবউ কাদম্বিনীর কাছে তার বৈমাত্র ভাই কেষ্ট আশ্রয় পায় মায়ের মৃত্যুর পরে। এরপর স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেষ্টকে ব্যবহার করেও তার দুমুঠো অন্নের বিষয়ে তাদের নিদারুণ ঔদাসীন্য বাড়ির মেজোবউ হেমাঙ্গিনীকে আঘাত করে। কেষ্ট অতঃপর হেমাঙ্গিনীর স্নেহচ্ছায়ায় প্রশান্তি পায় এবং বিষয়টি বড়োবউয়ের কটাক্ষের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। মেজোবউ হেমাঙ্গিনীর কেষ্টর প্রতি এই বাৎসল্য পরিশেষে সমস্ত পারিবারিক ও ব্যক্তিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে জয়ী হয়। কেষ্ট হেমাঙ্গিনীর স্নেহকে প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিলো -

'সে দুঃখীর ছেলে, কিন্তু কখনও দুঃখ পায় নাই। লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সহিত তাহার পূর্বপরিচয় ছিল না, তথাপি এখানে আসা অবধি কাদম্বিনীর দেওয়া দুঃখ-কষ্ট সে যে অনায়াসে সহ্য করিতে পারিতেছিল, সে শুধু পায়ের তলায় অবলম্বন ছিল না বলিয়াই। কিন্তু আজ আর পারিল না, আজ সে হেমাঙ্গিনীর মাতৃস্নেহের নির্ভর-ভিত্তির সন্ধান পাইয়াছিল, তাই আজিকার এই অত্যাচার অপমান তাহাকে একেবারে ব্যাকুল করিয়া দিল। মাতাপুত্র এই নিরপরাধ নিরাশ্রয় শিশুকে শাসন করিয়া, অপমান করিয়া, দন্ড দিয়া, চলিয়া গেলেন, সে অন্ধকার ভূমিশয্যায় পড়িয়া আজ অনেকদিন পর আবার মাকে স্মরণ করিয়া, মেজদির নাম করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।'[15]

নিঃসন্তান নারীর স্নেহসিঞ্চনের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিলো কেষ্ট, এখানে নারীর মাতৃস্নেহের স্বরূপটি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নিঃসন্তান গৃহবধূর নারীহৃদয়ের স্নেহধারা কখনোই অন্তর্হিত হয়না, বরং তা আশ্রয়ের অনুসন্ধানে থাকে ব্যাপৃত কিন্তু এই আশ্রয় আপন সন্তান না হওয়ায় বিচিত্র পারিবারিক সমস্যার উদয় হয়। নিভৃতে কাতর মাতৃহৃদয়ের আর্তনাদের খোঁজ রাখেনা কেউ।

সাহিত্য শিল্পীর মানসকল্পনার মূর্ততার ক্ষেত্র, তাই কেবল রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্রগুলিকে কল্পনার সৃজন বললে আর বিপরীতে শরৎচন্দ্রের নারীদের বাস্তবতা প্রতিফলনের বিষয়ে চরমোৎকর্ষ বললে কিছুটা সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য আমাদের অভিমত। শরৎচন্দ্রের শিল্পীমানস স্বাভাবিকভাবেই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছে চরিত্র পরিকল্পনায়। কিন্তু সে কল্পনা বাস্তবকে আশ্রয় করে হয়েছে পাঠকের হৃদয়গ্রাহীতার সহায়ক। শরৎচন্দ্রের নারীদের মধ্যে যে সজীব হৃদয়ের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়, তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, আবেগ

[14] চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). *শরৎ সমগ্র ২*. রামের সুমতি. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট. পৃঃ ৪৮৭.

[15] চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). *শরৎ সমগ্র ২*. মেজদিদি. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট. পৃঃ ৫৩২.

পুরুষের সাপেক্ষে কম মূল্যবান নয়। রবীন্দ্রনাথের নারীরা উপন্যাসে গতিময় হলেও, বহুক্ষেত্রে উপন্যাসের ঘটনানিয়ন্ত্রক হলেও ,বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তাদের সংযোগ অনেকাংশেই বিচ্ছিন্ন, তাদের কর্মক্ষেত্র কিছুটা সীমিত। বিপরীতে শরৎ সাহিত্যে নারীর স্থান ব্যাপক ও নির্দিষ্ট। এই নারীহৃদয়ের সঙ্গে তৎকালীন সমাজের দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্রের দৃষ্টির অন্তরালে থাকেনি। জীর্ণ সমাজ তার প্রথার ও সীমাবদ্ধতাসূচক স্তম্ভগুলি দেখিয়ে দেখিয়ে যেন নারীদের শৃঙ্খলিত করতে চেয়েছে বারংবার। আর এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই মূর্ত হয়ে উঠেছে শরৎচন্দ্রের নারীরা। প্রখ্যাত সমালোচক শরৎ সাহিত্যে নারীদের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন পাঁচটি ভাগে - বারাঙ্গনা, গৃহত্যাগী বিধবা, গৃহত্যাগী সধবা, নীরব প্রেমিকা ও কুমারী। শরতের সাহিত্যে নারীর রূপের চেয়ে বৃহত্তর গুরুত্ব পেয়েছে তাদের অন্তর্জগতের বিচিত্র লীলা ও ব্যথা। তবে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা তাঁর প্রতিপাদ্য ছিলো না কিন্তু সমাজের পক্ষে আশু প্রয়োজনীয় যে পরিবর্তন, তা অন্তরে গ্রহণ করার জন্য যে মানসিক ঔদার্যের প্রয়োজন তা সত্যিই বিরলদৃষ্ট। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে হরেন্দ্রের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় -

'আশুবাবু বলিলেন, হরেন্দ্র একটি চমৎকার কথা বলছিলেন কমল। শুনলে হঠাৎ হেঁয়ালি বলে ঠেকে, কিন্তু বস্তুতঃই তা সত্য। বলছিলেন, লোকে এইটিই বুঝতে পারে না যে, প্রচলিত সমাজবিধি লঙ্ঘন করার দুঃখ শুধু চরিত্র- বল ও বিবেক-বুদ্ধির জোরেই সহা যায়।'[16]

গ্রন্থপঞ্জী:

1) বন্দোপাধ্যায়, অসিত কুমার. (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ). আধুনিক *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত*, কলকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সি.
2) মজুমদার, মোহিতলাল. (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ). শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র. হাওড়াঃ বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়.
3) চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). শরৎ সমগ্র ১. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট.
4) চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). শরৎ সমগ্র ২. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট.
5) চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). শরৎ সমগ্র ৩. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট.
6) চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). শরৎ সমগ্র ৪. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট.
7) চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). শরৎ সমগ্র ৫. শ্রীকান্ত. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট.

[16] চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. (১৯৮৯). *শরৎ সমগ্র ৩.* শেষপ্রশ্ন. কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট. পৃঃ ৪৬০.